Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
UGC Enlisted Serial No. 48666
Impact Factor: 6.28 *(Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-I, July 2018, Page No. 72-79
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মাদ্রাসা শিক্ষা ও রাজনীতি : প্রাক স্বাধীন বাংলা ও স্বাধীনোত্তর পশ্চিম বাংলা

আবু এমদাদ মোঃ আব্দুর রাকিব
সহকারী অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, খেজুরী কলেজ, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The history of Madrasa Education in Bengal reveals the close relationship between the discourse of power and the ideological structures of education. Madrasas had evolved in the Arab world as a system of religious education, focusing on the Quran, Sunnah and Fiqh. After the invasion of Bengal by Baktiar Khilji, Madrasas became closely associated with the proliferation of state power. This close correspondence was destabilized by colonial rule in Bengal. The colonizers initially helped in the foundation of the Alia Madrasa (Calcutta Madarasa). This was soon transformed into a policy of hegemony in which Western Education was introduced in the Madrasa curriculum. With the formation of Muslim League in 1906, a salient vision for Islamic education was chalked out under the auspices of Muslim Educational Society. Modernization continued in post-independence West Bengal, with the development of West Bengal Board of Madrasa Education. This was counterpointed by Khareji Madrasas in Bengal of the Deobandi and Nadwatul Ulama schools. However, the call for reformation of the curriculum— be it from traditionalists or from modernists – inevitably involve a political understanding of the discourse of education. Thus, such reformulations are to be understood under a broader political matrix of inequality, hegemony and control.

Keywords: Madrasa, Colonialism, Pedagogy, Power politics, Modernization.

গতিশীল ও জটিল প্রক্রিয়া হিসেবে শিক্ষা সমাজ বিবর্তন ও সমাজ পরিবর্তনের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। বহুকাল ধরে পরিবার প্রকৃতি ও ধর্মের মাধ্যমে পরোক্ষ শিক্ষার প্রচলন লক্ষ্য করা গেলেও কাগজ ও মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পর থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে মাদ্রাসার গুরুত্ব সুপ্রাচীন কাল থেকে লক্ষ্য করা গেছে। মদ্রাসা কথাটি এসেছে ’দারস’ শব্দ থেকে। ’দারস’ শব্দটির ব্যুতপত্তিগত অর্থ হল ’শিক্ষা’ বা ’প্রশিক্ষণ’। ’মাদ্রাসা’ শব্দটি একবচন। বহূবচনে ‘মাদারিস।[১] অর্থাৎ অধ্যায়ণ ও অধ্যাপণার স্থানকে ‘মাদ্রাসা’ বলা হয়। মূলত আরব দুনিয়ায় শিক্ষা অর্জনের সাথে সাথে স্রষ্টার ইচ্ছা ও আদর্শের অভিব্যক্তি এবং হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সুন্নাহকে (practice of Muhammad (SW) ঐকান্তিকভাবে পালন করার ক্ষেত্রে মাদ্রাসা অণুপ্রেরকের ভূমিকা পালন করেছে। যার সত্যতা বর্তমানেও সমুজ্জ্বল। এই অর্থে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের হাত ধরেই মাদ্রাসার পথ চলা শুরু। ইসলামিক নানবিধ অনুশীলনের অন-আনুষ্ঠানিক, উপ-আনুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারাকে অতিক্রম করার মধ্যে দিয়েই পুর্ণতা আসে মাদ্রাসা শিক্ষার।[২]

আরব ভূমিতে মাদ্রাসা শিক্ষার সূচনা হলেও ব্যবসা বাণিজ্যের সুবাদে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় ভারতবর্ষ তথা বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জেও আরবদের যাতায়াতের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার সূচনা হয়। মুলত ৭১২ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদ বীন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের সূচনা এবং পরবর্তীকালে বাংলা পর্যন্ত এর বিস্তৃতি লাভ করে। বাংলায় মুসলিম শাসনকালে (১২০৪-১৭৫৭) অধিকাংশ মুসলিম শাসক ও আলীম (Scholars) ও সূফী সাধক ধর্মপ্রচারের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানকে কর্ত্তব্য মনে করেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মসজিদ্, মসজিদ-কেন্দ্রিক মাদ্রাসা, মক্তব ও খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম শাসকগন এবং বিত্তবান ধর্মপরায়ন ব্যক্তিরা এইসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যয় ভার গ্রহন করেন।[৪] কিন্তু বৃটিশরা বাংলার নবাব কে ক্ষমতাচ্যুত করার ২৩ বছর পর অর্থাৎ ১৭৮০ সালের ৩রা অক্টোবর আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে শুরু হয় মাদ্রাসা শিক্ষার নতুন ধারা। মাদ্রাসা শিক্ষাকে ঘিরে তৈরী হয় মিশ্র প্রতিক্রিয়া ও পারস্পরিক (মুসলিম বনাম বৃটিশ) দোষারোপের রাজনীতি এবং মুসলিমদের আত্ম-প্রত্যয়ের রাজনীতি। অপর দিকে বৃটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাবার পর পশ্চিম বঙ্গের মাদ্রাসা শিক্ষাকে সামনে রেখে যে রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয় ... এই সমস্ত নানাবিধ বিষয় গুলি নিয়ে, ইতিহাসের আলোকে আমাদের আলোচনার সুত্রপাত করছি।

কুতুবুদ্দিনের এক সেনাপতি বখ্তিয়ার খিলিজী প্রথম, বাংলায় মসজিদে মাদ্রাসা স্থাপন করেন। মূলতঃ সেই সময় ধর্মান্তরিত মুসলমান শিশুদের শিক্ষার জন্যই বাংলায় মক্তব ও মাদ্রাসা শিক্ষা চালু হয়। অবশ্য হিন্দুরা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত এমন নজিরও পাওয়া যায়।[৫] বেশির ভাগ মাদ্রাসা ছিল অবৈতনিক আরবি এবং ফার্সি ভাষার মাধ্যমে দরসে-নিজামিয়ার পাঠ্যসূচী অনুযায়ী ন্যায়শাস্ত্র, জোতির্বিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা আইন শাস্ত্র সহ ইসলামের মূলনীতি প্রভৃতি পড়ানো হত।[৬] দ্বাদশ শতকে মুসলিম শাসকগন নেতৃত্বে মাদ্রাসা গুলি উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠলেও, বৃটিশ মডেলের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠার কারণে গুরু গৃহ, পাঠশালা, তক্ষশীলার ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষার মডেল বাতিল হয়ে যায়।[৭] কেননা বৃটিশরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন নিজেদের স্বার্থের কারণেই।[৮] এই শিক্ষানীতি পরিবর্তনের পিছনে আছে এক দীর্ঘ ইতিহাস আর এই ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসেবে অ্যাডামের রিপোর্ট টি ভীষনই গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যাডামের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলায় হিন্দুদের টোল এবং মুসলিমদের মাদ্রাসা ছিল উচ্চশিক্ষার মূল কেন্দ্র বিন্দু।[৯] কিন্তু বৃটিশ শাসনাধীন বাংলায়, প্রথম পর্যায়ে তারা (বৃটিশরা) ব্যবসা-বানিজ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলেও অচিরেই বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে নজর দেয়। তার উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল –সদ্য মুসলিম শাসকদের হাত থেকে ক্ষমতা দখলের পর মুসলমানদের মনোরঞ্জন করা এবং ফার্সি ভাষা জানা মানুষের অভাবে রাজকার্য পরিচালনার অসুবিধা দূর করা। এই লক্ষ্যে তৎকালীন ইংরেজ গভর্ণর লর্ড ওয়ারেন্ হেস্টিংস মওলানা মজিদ উদ্দিন এর নেতৃত্বে শিয়ালদহের রেল স্টেশনের কাছে একটি ভাড়া বাড়িতে ১৭৮০ সালের ৩রা অক্টোবর আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[১০] মওলানা মজিদ উদ্দিনের নেতৃত্বে খুব অল্প সময়ের মধ্যে যে লক্ষ্য (প্রশাসনিক ও বিচারকার্য পরিচালনার লক্ষ্যে ব্যপক ফার্সি জানা লোকবল তৈরী করা) যে লক্ষ্যে আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করাহয়, সেই লক্ষ্য পুরণে সমর্থ হওয়ার দরুন ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮২ সালে আলিয়া মাদ্রাসা-কে সরকারী মাদ্রাসায় রুপান্তরিত করেন।[১১] হেস্টিংসের এই শিক্ষানীতি মিশ্র প্রতিক্রিয়ার (একদিকে মনে করা হয় হেস্টিংস বৃটিশ স্বার্থেই আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, অপরদিকে মনে করা হয় আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলিম-ইংরেজ সখ্যতা তৈরী হয়) সৃষ্টি করে।

বাংলা থেকে ওয়ারেন হেস্টিংস বিদায় নেবার (প্রথমবার) পর বৃটিশ সরকার ১৯৯১ সালে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারে সচেষ্ট হলে ওয়াকফ (জনস্বার্থ বা সমাজকল্যাণে ব্যবহৃত) সম্পত্তির দোহায় দিয়ে। মুসলিমরা বৃটিশ সরকারকে বাধা প্রদান করেন। মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারে বাধা প্রাপ্ত হয়ে বৃটিশ সরকার মাদ্রাসা বিষয় সম্পর্কীত যাবতীয় বিষয় পর্যালোচনা করে মাওলানা মজিদ উদ্দিনের বিরুদ্ধে অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলে গভর্ণর জেনারেলের

কাছে সুপারিশ করে। জিপম্যান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে আলিয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে মজিদ উদ্দিনকে সরিয়ে দেওয়া হয়। হেস্টিংস মুসলিম-ইংরেজ সখ্যতা তৈরীর যে চেষ্টা করেছিলেন সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে, তা অনেকটাই ফিকে হতে থাকে। ১৮১৩ সালে দেওয়ানী চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পাক-ভারত বাংলার-গভর্ণর জেনারেল পদে ওয়ারেন হেস্টিংস পুনরায় নিযুক্ত হলে বাংলায় মাদ্রাসা শিক্ষার নতুন ধারার জন্ম হয়।[১২]

১৮১৩ সালে পাস হওয়া শিক্ষা নীতি বাংলার মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি টার্নিং পয়েন্ট। নতুন এই শিক্ষা নীতিতে সরাসরি ভাবে একজন ইংরেজ (Ayron) সেক্রেটারী হিসেবে নিযুক্ত হন। উদ্দেশ্য ছিল নব উদ্দ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ঘটানো। কিন্তু বৃটিশদের এই প্রয়াস মুসলিমদের একটি অংশ কূটকৌশল হিসেবেই দেখেছিল। কারণ ১৮১৩ সালের শিক্ষা নীতিতে ভারতীয়দের শিক্ষা খাতে এক লক্ষ টাকা খরচ করার কথা বলা হলেও ১৮২৩ সাল পর্যন্ত কোন টাকা খরচ হয়নি। বরং পাদ্রিরা ইচ্ছানুযায়ী নানা স্থানে স্কুল প্রতিষ্ঠা করলে সেখানে এই টাকা খরচ করা হয়।[১৩] এই সময় হিন্দু প্রগতিশীল বাঙালিরা ইংরেজদের কাছাকাছি আস্তে শুরু করে। বিশেষ করে রাম মোহনের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা কলকাতায় কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উদ্‌বুদ্ধ হয়। এই প্রগতিশীল বাঙালিরা যখন কলেজ তৈরীতে উদ্‌বুদ্ধ হচ্ছে ঠিক তখনই কিছু উল্লেখযোগ্য মুসলিম পরিবার, তাঁরা তাদের ছেলে মেয়েকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভর্ত্তি করছে। তখন বৃটিশ সরকার ১৮২৬ সালে আলিয়া মাদ্রাসায় একটি ইংরেজী ক্লাস চালু করেন।[১৪]

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ক্লাস চালু হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই সেটি বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় ২৫ বছর ধরে এই কলেজটি (আলিয়া মাদ্রাসা মহামেডান কলেজ) দৃষ্টির অগোচরে চলে যায় এবং স্থানীয় সরকার এর অস্তিত্ব সম্পর্কে অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন। পক্ষান্তরে ১৮৫১-১৮৫৩ সময় কালে কলেজটির পুনরায় সংস্কার করে দুটি বিভাগে বিভাজিত করা হয়। একটি বিভাগ অ্যাংলো পার্সিয়ান শাখা, অপরটি আরবি বিভাগ। দু-এক বছরের জন্য এই সংস্কার কিছুটা সুযোগ পাওয়া পেলেও পুনরায় আবার কলেজটি আগের অবস্থায় ফিরে যায়। এর পিছনে অন্যতম কারণ ছিল, এই কলেজটির তদারকের অবস্থা আশানুরূপ ছিলনা। অতি অল্প সময়ের মেয়াদে একজন ইংরেজ প্রিন্সিপ্যাল থাকলেও তার হাতে বৃটিশ সরকারের অধিক দ্বায়িত্ব থাকার ফলে মাদ্রাসার কাজকর্ম খুব ভালো ভাবে তদারক করতে পারেন নি।[১৫]

শুধুমাত্র তদারকির কারণেই আলিয়া মাদ্রাসা সম্পূর্ন ভাবে পিছিয়ে পড়েছিল এমনটা বলা সমিচীন হবেনা। কারন ঐতিহাসীকদের মতে আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষা সংস্কার পুরোটাই ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কারণ শিক্ষা যদি ক্ষমতা হয় সেই শিক্ষার অলিন্দে থেকে লড়াই করা কষ্টকর হবে বলে মনে করেছিলেন বৃটিশরা। ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে ভীষন ভাবে প্রয়াসী লর্ড ম্যাকালে যা চেয়েছিলেন (প্রাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার) হয়তো বা তা সম্পূর্ন করতে পারেননি। তার উল্লেখযোগ্য প্রমান ১৮৫৭ সালে যে সিপাহী বিদ্রোহ হয় সেই সিপাহী বিদ্রোহ আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের একটা অংশ এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে।ফলস্বরুপ লেঃ গভর্ণর সিসিল-বেডেন ও তার সেক্রেটারি মিঃ গ্রে, উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের বক্তব্য কে সামনে রেখে (মাদ্রাসা শিক্ষা সরকারের কোনো কাজে আসছেনা তাই মাদ্রাসা শিক্ষার পেছনে অর্থ ব্যয় করা অনুচিৎ এবং অচিরেই মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া উঁচিৎ) আলিয়া মাদ্রাসাকে বন্ধের জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু তদানিন্তন কালের আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল মি: লিজ (Sir W. Nassee Lees) তাঁর লিখিত তিব্র প্রতিবাদের ফলে মাদ্রাসা বন্ধ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়।[১৬]

১৮৬০ সালে মি: লিজ (Sir W. Nassee Lees) এর নেতৃত্বে আলিয়া মাদ্রাসার ব্যপক সংস্কার হওয়া সত্বেও তার কিছু সময় পরেই, আলিয়া মাদ্রাসার পঠন-পাঠন সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন। বিশেষ করে পঠন -পাঠনের মান নিয়ে।[১৭] ফলে ১৮৮৯ খ্রী: ভারত সরকারের লে:গভর্নর এই মাদ্রাসায় পরিচালিত পঠন-পাঠনের ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার C.H. Campbell, প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল **J.Sutcliffe**

এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল লতিফ কে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী মাদ্রাসার বহু সংস্কার সাধন হয়। ১৭৭১ খ্রী: হেস্টিংস Norman কে প্রেসিডেন্ট এবং নবাব আবদুল লতিফ কে সেক্রেটারি করে কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির ১৮৭৩ সালে আবার রিপোর্ট প্রদান করেন ভারত সরকারের নিকট। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী পুনরায় মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু রদবদল করা হয়। ১৮৮২ খ্রী: W.W. Hunter কে প্রেসিডেন্ট করে, নবাব আব্দুল লতিফ এবং আমীর আলীকে সদস্য করে ভারতের শিক্ষা পদ্ধতি রিভিউ করার জন্য গঠিত হয় এডুকেশন কমিশন। এই কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৮৪ সালে মাদ্রাসার কিছুটা উন্নতি সাধিত হয়।[১৮]

মাদ্রাসার উন্নতি সাধনের সাথে সাথে উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে মুসলিমরা ইংরেজি শিক্ষায় পিছিয়ে থাকলেও ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশনের বদৌলতে মুসলিমদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ব্যপক প্রীতি লক্ষ্য করা যায়। তবে মুসলিমদের এই পুনর্জাগরণের পিছনে শুধুমাত্র হান্টার কমিশনই সম্পূর্ন কৃতিত্বের অধিকারী এটা বলা যায় না। কেননা হান্টার কমিশনের পূর্বেই ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিমদের পিছিয়ে পড়াকে নিয়ে অনেক বুদ্ধিজীবিদের লেখনি এবং প্রগতিশীল কিছু মুসলিম ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংগঠন অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিল। এগুলি হল –আব্দুল লতিফের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ‘কলিকাতা’ লিটারারি সোসাইটি (১৮৬৩), সৈয়দ আমির আলীর নেতৃত্বে ‘সোস্যাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন’(১৮৭৭) (পরবর্তি কালে এই সংগঠন টি মুসলিম লীগ এ পরিণত হয়) এবং ঢাকার সুহৃদ সম্মিলনী’।[১৯]

১৮৮২ সালের শিক্ষাকমিশনের সুফলে ১৮৯১ পর্যন্ত ব্যপক পরিমাণে মাদ্রাসার বৃদ্ধি হলেও বিংশ শতকের শুরুতেই বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গকে ভাগের হাত থেকে রক্ষা করাকে ঘিরে এক চুড়ান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃস্টি হয়। এর ফলে হিন্দু-মুসলমানদের মতে পরস্পর বিরোধী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।। উভয় জাতীর রাজনীতি দুটি সুস্পষ্ট পৃথক ধারায় প্রবাহিত হয় বলে কোন কোন ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানিক মনে করেন।[২০] বিশষজ্ঞদের মত অনুযায়ী প্রশাসনীক বা কলকাতা কেন্দ্রিক কংগ্রেসি হিন্দু নেতৃবৃন্দের বৃটিশ বিরোধী রাজনীতিকে খর্ব করার মানসে, বৃটিশ গভর্মেন্ট কর্তৃক ১৯০৪ সালের ১৬ই অক্টোবর পশ্চিম বঙ্গ থেকে, পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গড়ে ওঠা মুসলিমদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল। যদিও মুসলিমদের একটা অংশ বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতা করেছিল। হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতা করেছিলেন। অবশ্য তদানিন্তন কালের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ এর ক্ষেত্রে মুসলিম নেতৃবৃন্দের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এর অন্যতম কারণ হিসেবে ঐতিহাসিকগণ যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন তা হল ওয়াহাবী আন্দোলনে এবং সিপাহী যুদ্ধে প্রত্যাশিত ফল অর্জিত না হওয়া এবং বৃটিশদের জোর জুলুমে মুসলিমদের পর্যবশিত হওয়া।[২১] কিন্তু ১৯০৬ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তা ব্যপক পরিমানে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে মুসলিমদের অংশ গ্রহন এবং অন্যান্য দাবী দাওয়ার সাথে সাথে মুসলিমদের শিক্ষা সমিতি গুলি মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা চালায়।[২২]

১৯০৬ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির (বঙ্গভঙ্গের সময়কালের পূর্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষাসমিতির মধ্যে ছিল) অনুষ্ঠিত প্রথম অধিবেশণে নবাব সলিমুল্লাহ, নবাব আলী চৌধুরী, এ.কে. ফজলুল হক, নবাব মুহসিনুল মুলক, আব্দুল করিম, নবাব শামুসল হুদা, আবু নাসর ওহীদ প্রমুখ মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তন করে মুসলিম সমাজ কে ইংরেজি শিক্ষার দিকে উদ্ভুদ্ধ করতে উদ্যোগী হন। তার অন্যতম কারণ ছিল মুসলিমরা যাতে কর্ম নিযুক্তির ক্ষেত্রে পিছিয়ে না পড়ে এবং রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে পারে।[২৩] ফলে আবু নাসর ওহীদ সর্ব প্রথম মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারন শিক্ষার ন্যায় ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য পরামর্শ দেয়। এই প্রস্তাবগুলি ১৯১৫ সালে মেনে নিয়ে নিউ স্কিম মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচলন হয়।[২৪] এক্ষেত্রে আবু নাসর ওহীদ এর প্রস্তাবটি মানার পেছনে একটি কারণ ছিল। কারণটি হল১৯১১ সালের

বঙ্গভঙ্গ রদ্দের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯১৫ সালের ১লা এপ্রিলের মধ্যে সারা দেশে এই নিউ স্কিম মাদ্রাসা চালু করা হয়।[২৫]

নিউ স্কিম মাদ্রাসা বা হাই মাদ্রাসা ছাড়াও বাংলায় আর এক ধরণের মাদ্রাসা লক্ষ্য করা যায় সেটি হল সিনিয়র মাদ্রাসা। যে সমস্ত মাদ্রাসাগুলি পুরানো ঐতিহ্যগত শিক্ষাধারাকে (দরসে নিজামিয়ার শিক্ষা ধারা) বজায় রেখেছিল সেগুলিই মূলতঃ সিনিয়র মাদ্রাসা। নিউ স্কিম মাদ্রাসা বা হাই মাদ্রাসার পরীক্ষা বিভিন্ন বোর্ডের মাধ্যমে হত, যেমন 'The Board of Islamic Intermidiate' এবং University of Daca' অপরদিকে, ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'The Board of Central Madrasah' সিনিয়র মাদ্রাসার পরীক্ষা পরিচালনা করত। মূলতঃ তিন ধরণের পরীক্ষার প্রচলন ছিল সিনিয়র মাদ্রাসা গুলিতে। ১] আলিম ২] ফাজিল ৩] টাইটেল যথাক্রমে ৬ বৎসর, ৮ বৎসর এবং ১০ বৎসর পড়াশুনার পর এই পরীক্ষা গুলি নেওয়া হত।[২৬] এই পদ্ধতি ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত একই রকম ছিল।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর আলিয়া মাদ্রাসার স্থানান্তর ঘটে। এটি বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকায়। ফলে পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা গুলির অনুমোদন নিয়ে একটি জটিল পরিস্থিতির তৈরী হয়। এই লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হুগলি মাদ্রাসার অধ্যক্ষের নেতৃত্বে 'West Bengal Board of Madrasah Education' গঠন করা হয়। পরবর্তি কালে ১৯৪৯ সালের ৪ ই এপ্রিল) স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ড: বিধান চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে মাদ্রাসা বোর্ড নতুন করে গঠিত হয়। যার নাম দেওয়া হয় 'West Bengal Madrasah Examination Board'[২৭] ১৯৬৪ সালে পুনরায় 'West Bengal Board of Madrasah Education (WBBME)' নামে নব উদ্যোমে যাত্রা শুরু করে। যার অধিনে পশ্চিমবংগের জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা, হাই মাদ্রাসা এবং সিনিয়র মাদ্রাসা গুলি পরিচালিত হয়। মূলতঃ পশ্চিমবঙ্গের মূল স্রোতের যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেই শিক্ষা ব্যবস্থার ন্যায় শিক্ষা পদ্ধতি পরিচালিত হয়। এমন কি পাঠ্যসূচী এবং পাঠ্য বই ও একই রকম। পার্থ্যক্য শুধু তৃতীয় ভাষা হিসেবে আরবিকে বাধ্যতা মূলক করা হয়।[২৮]

স্বাধীনোত্তর পশ্চিম বাংলার WBBME এর প্রতিষ্ঠা যেমন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তেমনি আলিয়া মাদ্রাসা আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রুপান্তরিত হওয়াও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কেননা ১৯৪৯ সালে Madrasah Education Board গঠিত হওয়ার পরেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার অগ্রগতি প্রসঙ্গে একটি রিভিউ কমিটি গঠন করেন। রিভিউ কমিটি আলিয়া মাদ্রাসার বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার পক্ষে সওয়াল করে।[২৯] অবশ্য আলিয়া মাদ্রাসাকে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে ১৯৫১ সালের রিভিউ কমিটি প্রথম প্রস্তাবক নয়। কেননা তার অনেক আগে যখন (১৯১১) A. H. Hurley এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা Muhamedan Education Advisary Committee –এর সুপারিশ থাকার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠা ঠিক কিছু কাল পরেই ১৯২১ খ্রী: শামসুল হুদা কমিটি, ১৯৩১ সালে Muslim Education Advisary Committee প্রভৃতি কমিটিগুলি আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করে আলিয়া মাদ্রাসাকে একটি ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় করার সুপারিশ করে। কিন্তু সুপারিশ গুলি কার্যকর হয়নি। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই আলিয়া মাদ্রাসা বাংলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার সমস্ত মাদ্রাসা গুলিকে অনুমোদন দিত।[৩০] ফলে স্বাধীনোত্তর বাংলায় ১৯৫১ সালের রিভিউ কমিটি আলিয়া মাদ্রাসাকে বিশবিদ্যালয় করার পক্ষ্যে পুনরায় সওয়াল করে।

তৎকালীন সরকার আলিয়া কে বিশ্ববিদ্যালয় না করে পুনরায় মাদ্রাসা রিভিউ কমিটি, এবং ১৯৭৩ সালে Senior Madrasah Education System Commeetee গঠন করেন। ১৯৭৩ এ কমিটির মত অনুযায়ী নতুন করে Madrasah Education Board তৈরী করে ' কলিকাতা মাদ্রাসা' থেকে এই বোর্ডটিকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন করে কলিকাতা মাদ্রাসাকে পুরোপুরি ভাবে Calcutta Madrasah Collage এ পরিণত করা যায়।[৩১]

২০০২ খ্রী: পশ্চিমবঙ্গ সরকার A.R. Kidwai এর নেতৃত্বে A.R. Kidwai 'Madrasah Education' কমিটি গঠন করেন। Kidwai কমিটি-র সুপারিশ অনুযায়ী আলিয়া মাদ্রাসাকে Deemed Univeersity করার কথা বলা হলেও মাদ্রাসা কলেজ কে upgrade করে একটি পূর্নাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দান করেন।[৩২] Deemed University র পরিবর্তে পূর্নাঙ্গ University হওয়ার পিছনে কি কারন ছিল এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে রাজনৈতিক কারণেই আলিয়া মাদ্রাসা কে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করে। কেননা ২০০৬ সালের ৩০শে নভেম্বর বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার কমিটি ৪০৩ পৃষ্ঠার রিপোর্ট প্রদান করেন। সেই রিপোর্টে বাংলার মুসলিমদের শোচনীয় অবস্থার কথা সামনে চলে আসার ফলে সারা রাজ্যে মুসলিমরা নানা ইস্যুতে আন্দোলন শুরু করেন। হয়তো বা সেই আন্দোলনে প্রলেপ দিতে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলির সাথে সাথে আরও এক ধরণের মাদ্রাসা লক্ষ্য করা যায় সেগুলিকে খারেজি বা কওমি মাদ্রাসা বলা হয়। এই মাদ্রাসা গুলির উৎসমূল নিহীত আছে উত্তর ভারতের কিছু উলামার নেতৃত্বে, সাহারানপুর দেওবন্দে ১৮৬৭ সালে গড়ে ওঠা দারুন উলুম [৩৩] এবং পরবর্তিকালে কুরাআন হাদিস সহ ফিকাহ, [৩৪] ইজমা,[৩৫] কিয়াসের [৩৬] ভিত্তিতে ১৮৯৪ সালে লখনৌ তে গড়ে ওঠা নাদ্ওয়াতুল উলামা আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বিকৃতি লাভ করেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বেশীর ভাগ মাদ্রাসা (খারিজি মাদ্রাসা) গুলি এই দুটি সংগঠনের শিলশিলায় পরিচালিত হয়।[৩৭] এই সমস্ত খারিজি মাদ্রাসা গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতগুলি মাদ্রাসা, যারা ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার আপগ্রেড করে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে চায়। সেক্ষেত্রে নতুন একধরনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া কে কেন্দ্র করে। বর্তমানে Un-aided মাদ্রাসা সংগঠন বিভিন্ন বঞ্চনা কে সামনে রেখে প্রতিনিয়ত আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। অপর দিকে মাদ্রাসা এডুকেশন ফোরাম, মাদ্রাসা ইউনয়ন পরিষদ প্রভৃতি সংগঠন গুলিও মাদ্রাসা সংক্রান্ত রাজনৈতিক প্রসঙ্গে অগ্রনি ভূমিকা পালন করছে বলে অনেকেই মনে করেন।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট ভাবে প্রতিয়মান হয় যে, প্রত্যেকটি শাসকের একটি নিজস্ব ভাষা থাকে। এবং সেই ভাষা কে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই শাসকের রাজনতৈক সফলতা - নির্ভর করে। এই নির্ভরতার সূচক নির্ধারনের জন্য একটি পরীক্ষা মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। আর পরীক্ষা সব সময় পরিচালিত হয় একটি যুগোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। ফলে একজন শাসকের উদ্দ্যেশ্য হল শিক্ষার রাজনীতিকরণ করা সেই রাজনীতি করনের একটি নিজস্ব ভাষা থাকে। সেই ভাষার প্রয়োগ শাসক এবং শাষিতের মধ্যে কখনও মধুর আবার কখনও বিরূপ সম্পর্কের বাতাবরণ তৈরী করে। শাসকের ভাষা যদি কর্মনিযুক্তির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি না করে, সেক্ষেত্রে সম্পর্ক টি মধুর আর ভাষা যদি কর্ম নিযুক্তির ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি করে সেই ক্ষেত্রে সম্পর্কটি বিরূপ। এই আলোচনাতেও আমরা ঠিক তাই লক্ষ্য করলাম। কারন বৃটিশরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ফার্সি কে গুরুত্ব দিয়েছিল রাজকার্য পরিচালনার জন্য। আবার মাদ্রাসা শিক্ষার পরিবর্তন (আরবি- ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজির প্রবর্তন) যুগের দাবী ছিল। দরসে নিজামিয়া শিক্ষাধারা আধুনিক ছিলনা বা পাঠ্য সূচী বিজ্ঞান ভিত্তিক ছিলনা এমনও বলা যায়না। তাহলে পরিবর্তন কিসের? পরিবর্তন ভাষার আর এই ভাষাকে (ইংরেজিকে) প্রাক স্বাধীন বাংলায় হজম করতে মুসলিমদের হোচট খেতে হয়। এই ভাষা না জানার জন্য যখন কর্ম নিযুক্তির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে হয় তখন মুসলিমরাও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে শাষকের ভাষাকে (বৃটিশদের ইংরেজি শিক্ষাকে) রপ্ত করতে চায়, ফলে উনবিংশ শতকের তুলনায়, বিংশ শতকে মুসলিমরা ইংরেজিকে ভালো চোখে দেখলেও দীর্ঘদিন কর্মনিযুক্তির ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার সুবাদে, মুসলিমরা যে অতল গহ্বরে তলিয়া যায় যার হদিস স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবাংলাতেও লক্ষ্য করা যায়। সাচার কমিটির রিপোর্ট তাঁর জ্বলন্ত দলীল। ফল স্বরূপ প্রাক-স্বাধীন বাংলার ন্যায় স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবাংলাতেও মাদ্রাসা শিক্ষার লেভেলে কর্মমূখী শিক্ষাকে আলীঙ্গন করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এমনকী পশ্চিমবাংলার খারিজি মাদ্রাসাগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। ফলে বৃহত্তর রাজনৈতীক পরিমণ্ডলে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা বহুচর্চিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১) ইসলামি বিশ্বকোষ, ১৭ শ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলা দেশ, ১৯৯৫) পৃ. ২৬৫

২) প্রাগুক্ত পৃ. ২৬৬

৩) আব্দুল খালেক, 'সাইয়েদুল মুরশালিন', (ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলা দেশ, ১৯৯০) পৃ. ১৭

৪) মুহম্মদ আব্দুল বাকী, 'বাংলা দেশে আরবি ফার্সি ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা' (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলা দেশ, ২০০৫)

৫) পরমেশ আচার্য, 'বাংলার দেশজ শিক্ষার ধারা', কলকাতা – অনুস্টুপ প্রকাশনি, ২০০৯, পৃ. ১৫৩

৬) মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাসুম 'বাংলায় মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি (১৮৩৫-১৯২২) (ঢাকা বাংলা এ্যাকাডেমী, বাংলা দেশ, ২০০৯, পৃ. ১৪৩

৭) ড. হিমাংসু ঘোষ; 'উচ্চশিক্ষা ও পশ্চিমবঙ্গ', যোজনা, জানুয়ারী ২০১৬।

৮) Arjumend Ara, 'Madrasahs & making of Muslim Identity in India, Economic and Political weakly (EPW) January -3 2004.

৯) হিমাংসু ঘোষ, উচ্চশিক্ষা ও পশ্চিমবঙ্গ, যোজনা জানুয়ারী ২০১৬।

১০) Najma Akhtar – Manju Narula, 'The Role of Indian Madrashs in providing Access to Mainstream Education for Muslim Minority students. 'A West Bengal Experience' Published online 29th January, 2010 Springer Science & Business media B.V. 2010.

১১) মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুম, 'বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি', পৃ. ১৪৪।

১২) আব্দুস সাত্তার,'আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস' অনুবাদ: মোস্তাফা হারুন ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। পৃ. ৪৮

১৩) প্রাগুক্ত পৃ. ৬২

১৪) প্রাগুক্ত পৃ. ৬৩

১৫) ডব্লিউ, ডব্লিউ, হান্টার 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' আনুবাদ, এম আনিসুজ্জামান (ঢাকা খোশরেজ পাবলিকেশসনস্ লিঃ, বাংলাদেশ আগষ্ট ১৯৯৪, পৃ. ১৭৪

১৬) আবদুস সাত্তার, আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস' পৃ. ৮৯

১৭) মোঃ আবদুস সাত্তার, 'বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সমাজজীবনে তার প্রভাব' (ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ২০০৪) পৃ. ১৪৭

১৮) মোঃ শাহিদুল্লাহ, 'আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস' কলকাতা, নতুন-গতি, ঈদ সংখ্যা ২০১২, পৃ. ১২

১৯) মোঃ আব্দুস সাত্তার, 'বাংলা দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব' পৃ. ১৫৮

২০) মোঃ আবদুল্লাহ, 'রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা', ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী-২০০৯) পৃ. ২৩

২১) প্রাগুক্ত পৃ. ২৩

২২) প্রাগুক্ত পৃ. ২৪

২৩) আবদুল্লাহ আল মাসুম,'বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতী', পৃ. ১৪৮

২৪) Nilanjana Gupta,’Reading with Allah’, Routeladge, London, New York New Delhi 2009. Page 33.

২৫) মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ‘বাংলাদেশে খ্যতনামা আরবিবীদ’ পৃ. ৩১।
উল্লিখিতঃ মোঃ আব্দুস সাত্তার,’বাংলাদেশে, মাদ্রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব, পৃ. ১৮৬

২৬) Najma Akhtar – Manju Narula, ‘The Role of Indian Madrashs in providing Access to Mainstream Education for Muslim Minority students. ‘A West Bengal Experience’ Published online 29th January, 2010 Springer Science & Business media B.V. 2010. Page - 92

২৭) মোঃ শাহিদুল্লাহ,’আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস’ পৃ. ৪৬

২৮) Najma Akthar – Manju Narula Page – 97

২৯) মোঃ শাহিদুল্লাহ,’আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, পৃ. ২৪

৩০) প্রাগুক্ত পৃ. ৪৪

৩১) প্রাগুক্ত পৃ. ৪৫

৩২) প্রাগুক্ত পৃ. ৪৬

৩৩) Barbera Daly Metcalf, ‘Islamic Revival in Brittish India’ (1860-1900), Oxford University Press, 2002, Page 88.

৩৪) ফিকাহ্ শাব্দিক অর্থে উপলব্ধি করা, বুঝা বা জানা এবং বিশেষ অর্থে ইসলামিক অর্থশাস্ত্র বিজ্ঞানকে বোঝায়। দেখুন- আব্দুল রসিদ মতিন, ‘রাষ্ট্রবিজ্ঞানঃ ইসলামী প্রেক্ষিত’, বাংলাদেশ ইনিস্টিটিউট অফ ইসলামীক থ্যট, ঢাকা: ২০০৪ পৃ. ১৫১

৩৫) ইজমা – ইসলামী আইনের চারটি উৎসের একটি-প্রাগুক্ত পৃ. ১৫২

৩৬) কিয়াস – শরিয়তের চতুর্থ অংশ, প্রাগুক্ত পৃ. ১৫৬

৩৭) মোঃ আব্‌দুস সাত্তার,’বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব, পৃ. ৩৫১